পল্লীসংগঠন - উন্নয়ন, সমাজ-প্রগতি ও রবীন্দ্রনাথ

ড. অনির্বান রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বিশ্ববাসীর কাছে শিক্ষণীয় আদর্শ হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাঁর এই স্বদেশ প্রীতির মূলে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্নদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁর অনুপম উপলব্ধি। যে দেশে তিনি গেছেন, সে দেশের ইতিহাস - সংস্কৃতির প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন এবং সে-দেশের শিক্ষা - সংস্কৃতি উন্নয়ন ও লোকমানসের সম্যক পরিচয় তিনি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের উপসংহার অংশে রছেছে তার ইঙ্গিত। তিনি লিখেছেন— 'সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, সেটা আলোচনার যোগ্য। সেখানকার যেছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পেছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মুলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটিতত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।' (রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৯৮)

ভারতে সুদীর্ঘকাল ছিল হিন্দুরাজরাজাদের আমল। সে - যুগকে ইতিহাসের দিক থেকে বলা হয়— হিন্দু ব্রাহ্মণ্য যুগ। তারপর যুগের পরিবর্তনে এলো মুসলিম যুগ। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের চরিত্রগত যুগটির সম্যক পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন— 'ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ।' (ঐ, পৃ৯৮) এদেশের মাটিকে দখল নিতে একে একে এসেছে শক - হুনদল - পাঠন মোঘল। তারপর এলো বণিক ইংরেজ। কবি লিখলেন—'একদা 'য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্বমহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালো তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নতুন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল, ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল।' (ঐ. পৃ. ৯৮)।

আসলে প্রাচীনযুগ থেকে নানা ঐশ্বর্য - সম্পদে ভারত ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশীল। ভারতের মাটির ওপরকার সম্পদ ও মাটির ভেতরকার সম্পদ মিলে ভারতের যে বিপুল ঐশ্বর্য ছিল, তা অপহরণের জন্য ভারতের বাইরেকার বহুশক্তি তাদের সম্পদ - লোলুপতা নিয়ে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারত - ভূখণ্ডে। ভারতের ভেতরকার খণ্ড-বিচ্ছিন্ন শক্তি তার প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফলে, বাইরের শক্তিসমূহ ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে ভারতকে ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারের দিকে। ইংরেজ রাজশক্তি দেশ শাসনের সুযোগ নিয়ে দেশের সম্পদ অপহরণ করেছে নির্বিচারে। ফলে এ-দেশের কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। অস্বাস্থ্যও অপুষ্টিতে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়েছে ভারতের গ্রামীণ জনজীবনের স্বাস্থ্যববস্থা। ধন-উৎপাদনের বিচিত্রকর্ম হিন্দুযুগে কিংবা নবাব বাদসাহের আমলে ব্যাহত হয়নি, কিন্তু বণিকশ্রেণীর আগমনে এবং বিদেশী বণিককুল এ-দেশের শাসন - ব্যবস্থা হস্তগত করার পর উৎপাদন ব্যবস্থা থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন কালাবধি এ - দেশে ধনমহিমা ছিল, ধন-গরিমা ছিল না। বিদেশী বণিকশক্তি ধন-উৎপাদনের শক্তিকেই ক্রমশ পঙ্গু করে দিয়েছে। কবির মতে, লোভ-ই এর মূল কারণ। বণিককুল ধন- লোভে সমস্ত সম্পদ -শক্তিকেই গ্রাস করে নিয়েছে। কবি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন— 'রাজ গৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারেনা। ধন নির্মম, নৈব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে, লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধু সে জবাই করে।' (ঐ, পৃ. ১০০)

বহু প্রচলিত প্রবাদটিকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে কবি বণিক ইংরেজশক্তির অপহরণপটু চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণটি সন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা ও বিশ্বাসের মূলেও আঘাত হানতে তাঁর দ্বিধা জাগেনি। ইংরেজদের আমূল বিশাস যে —ভারতীয় তথা এ-দেশের জনগণের বহু প্রজননশক্তির জন্যই দেশের দারিদ্র্য। অর্থাৎ প্রজাবৃদ্ধি সমস্ত সমস্যার মূলে। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণসহ দেখিয়েছেন, যে ১৮৭১ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ৫০ বছরে ইংল্যান্ডে যেখানে প্রজাবৃদ্ধির হার ৬৬ শতাংশ, সেখানে ভারতের প্রজাবৃদ্ধির হার ৩৩শতাংশ, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের তুলনায় অর্ধেকমাত্র। তাহলে ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে ইংরেজদের অপপ্রচার কেন? কবির তাই যথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে ভারতে দারিদ্র্যের মূল কারণ প্রজাবৃদ্ধি নয়, মূল কারণ হল —অন্ন সংস্থানের অভাব। যে কৃষকেরা মুখে রক্ত তুলে ফসল ফলায়, মধ্যস্বত্বভোগী বণিক ইংরেজ তার মুনাফা তোলে। কৃষক ভোগে দারিদ্র্যে, ইংরেজরা ভোগে হয় আত্মহারা। তাই কবি লিখেছেন— 'বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাসহরণ ও ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁপে উঠেছিল।' (ঐ, পৃ. ১০৪) কবির মতে, লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান — এই সমস্ত প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত ও অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্ট মাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। কবির মতে, ভারতের পশ্চাদপরতার মূলে রয়েছে তার জাতীয় স্বভাব ও ধর্মচেতনা। পাশ্চাত্যদেশে সেখানে বণিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অর্থের ও সামর্থ্যের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে লেগেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সেখানে ভারতে তার সমাজধর্মের অপরিচ্ছন্নতা ও অসুস্থতা তাকে টেনে নামাচ্ছে নীচের দিকে। কবির উপলব্ধি তাই এইরকম— 'লোভ মানুষের সবচেয়ে বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সম্বন্ধ বন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।' (ঐ, পৃ. ১০৫)। কবির আরো উপলব্ধি এই যে, পাটের চাষীর শিক্ষার জন্যে স্বাস্থ্যের জন্য সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হা করে রইল, বিদেশগামী মুনাফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না।' (ঐ, পৃ. ১০৬) পাট পচিয়ে দেশের জলাশয়গুলির জল দূষিত হল, স্বাস্থ্য নষ্ট হল, কিন্তু শাসকশ্রেণীর তহবিল, বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি স্ফীতই থাকলো, একটি পয়সাও খসল না, পরিতাপের বিষয় এই যে, হতভাগা অশিক্ষিত মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল শুধু বিদেশীশাসক ও মহাজনসম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়ে আসছে। প্রসঙ্গত কবি বণিক উংরেজের প্রতিনিধি সাইমন সাহেবের বক্তব্যেরও প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে, 'প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে সমস্ত সুবিধা থাকতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে

কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণ তনু রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে - আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না। —আমরা কোনোমতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ করে এবং খরচপত্র কমিয়ে , আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করছেন, তাকে চিরদিন বহুল পরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব ক'রে।' (ঐ, পৃ. ১৩৭)

বণিক শাসক ইংরেজের এই চারিত্রিক দীনতা - ক্ষুদ্রতা কবিকে ব্যথিত করেছে অন্তঃস্থল পর্যন্ত। এই সমালোচনার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে কবির স্বদেশ - প্রাণতা, সবদেশের সার্বিক কল্যানের জন্য আন্তরিক আবেগ।

পৃথিবীর নানাদেশ ভ্রমণ করে কবি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন—তার আলোকে কবি নিজের দেশের অনগ্রসরতার মূলে যে কালো পটভূমিকাটি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, তা আলোচনা— প্রসঙোগ তাঁর সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি জুড়ে দিয়ে তার নতুনত্বটি আবিষ্কার করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার ভালো দিকজির যেমন ভূয়সী প্রসংসা করেছেন, তেমনি মন্দ দিকটির প্রতী তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কবি লিখছেন। —'রাশিয়ার পা বাড়িয়েই চোকে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায়, নিরন্ন, নির্যাতিত, নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতিলাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও, তা হয়নি'—(ঐ, পৃ. ১১০)

এ-দেশের মধ্যেকার জাতি-সম্প্রদায়গত ভেদবিভেদের পটে কবির দেখা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার কথা স্মরণযোগ্য। কবি লিখছেন—'ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে করে আমরা এতকাল ধরে ধনে মনে মরছি, এ-সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বত্ত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম, তখন সেটা আমাকে যত বড়ো আনন্দ দিলে, এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে — কোনো বিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ— সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যা ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।' (ঐ, পৃ. ১১১) —এটি হল সদর্থক দিক। আবার নঞর্থক দিকের সমালোচনা এইরকম। কবি লিখছেন—'ডিক্‌টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ার আজ ঘটেছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঞর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উল্টো।' (ঐ,পৃ. ১১৩)

এই বিষয়টিরই আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে কবির পরবর্তী আলোচনায়। কবি চিরকালই স্বাধীন মুক্ত মনের মানুষ। শিক্ষা - সংস্কৃতি কিছুতেই তিনি জোর জবরদস্তির পক্ষপাতি নন। যে নিষ্ঠুর শাসনের ধারাবাহিকতা ছিল রাশিয়ার জারের আমলে, ধর্মাচরণ, ধর্ম-নীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিতে মানবিকতার স্থান ছিল সংকুচিত, কবি চিরকাল তাকে অপছন্দ করে এসেছেন। জার শাসনকালের নিষ্ঠর শাসনশোষণ অমানিকতাকে বিপ্লব - উত্তর রাশিয়ার চিত্রযোগে, সিনেমাযোগে, ইতিহাসের ব্যাখায়, সাবেক আমলে নিদারুণ শাসনবিধিও ও অসদাচারকে বার বার দেখিয়ে জনসাধারণের মনে নিষ্ঠুর অমানবিক আচারের প্রতি প্রবল ঘৃণা উৎপাদন করিয়ে মানুষকে শোষণহীন সমাজের প্রতি অনুরাগী করে তোলার সযত্ন প্রচেষ্টা কবির ভালো লেগেছে। বিপ্লব - উত্তর রাশিয়াতেও নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি কবিকে খুব বেশি বিচলিত করতে পারেনি। সোভিয়েত রাশিয়াকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, আত্মশক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেখে কবির মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে যে, রাষ্ট্র শাসনের নামে জনগণের জীবনকে ছকবন্দী করে তোলায় যদিও তা কবির অপছন্দের বিষয়, তবু উন্নতির লোভহীন অগ্রগতির স্বার্থে কিছুটা জোর জবরদস্তির হয়ত প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে তাকে মেনে নিতেই হয়। কারণ কবির বিশ্বাস—'রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো, পুরাতন বিধি বিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা।' (ঐ, পৃ. ১১৬)

বিপ্লব-উত্তর রাশিয়ায় দুটি বিষয় কবি দেখেছেন— (১) জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রজা সাধারণের সমাজ অধিকার এবং (২) প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে জনগণের সম্মানলাভ। বৃটিশ ভারতের নাগরিক হিসাবে সোভিয়েতভূমি ও ভারতভূমির পার্থক্যটি কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

কবির মতে, মানবচবিত্রের দুটি দিক। একদিকে মানুষ স্বতন্ত্রপথের পথিক। অন্যদিকে সে সমাজের সঙ্গে যুক্ত। তাই শেষ সমাজকে বাদ দিয়ে তার যাত্রা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আর ভারতে সমাজ ব্যবস্থার মূলটা ছিল পল্লীসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির একটা সামাঞ্জস্য ছিল। ফলে, মানব সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, শাসকশ্রেণীর কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ থেকে নয়।

অন্যদিকে, শহরকে কেন্দ্র করে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এই যন্ত্রযুগের অবদান। কবির মতে, 'নগরে মানুষের সুযোগ বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো।' (ঐ, পৃ. ১২০) নগরে মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর ও একান্ত। ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের ব্যাধধানকে বাড়িয়ে তোলে। আসলে, একালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যতটা প্রবল শক্তির অধিকারী করেছে, ততটা আত্মসম্পদে বড়ো করেনি।

কবি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ধন - উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির ব্যবহার ব্যাপক নয়— অথচ এটিই ছিল একান্ত কাম্য। গ্রামগুলিকে শুধু শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত ভোগী করে রাখলে সেখানে মনুষ্যত্বের না হয় পূর্ণ বিকাশ, না হয় তার সম্পূর্ণ প্রাপ্তি। কবির মতে, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারা গ্রামসমাজ আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে অসহায়তা, নিম্নগামিতা থেকে উদ্ধার করতে পারে। কবি তাঁর এই অভিনব সমাজ ভাবনাটির প্রয়োগ চেয়েছিলেন বাস্তবসম্মত ভাবে।

উপাসনা-আশ্রমের অদূরে শ্রীনিকেতনে ছোট আকারে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রমাণ স্বপুর সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন

ও বন্টনব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়া-ভ্রমণে গিয়ে সেখানে এক বৃহৎ রাষ্ট্রব্যাপী কর্মযজ্ঞের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সমবায়প্রথা ভিন্ন অনুন্নত, দারিদ্র শ্রেণীর কৃষককূলের উন্নতি সম্ভব নয় বুঝেই কবি আক্ষেপ করে লিখেছেন— 'আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় - প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।' (ঐ,পৃ. ১২৩)

পরাধীন ভারতবাসী আত্মশক্তিতে দুর্বল বলেই স্বদেশীয়দের মধ্যে অবিশ্বাসের বিষ উথলে ওঠে। নিজের ওপর অশ্রদ্ধা থাকে বলেই অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। কবির তাই অভিমত এই যে, সমবায় প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে পল্লীবাংলার চরিত্র ও উন্নয়ন বিষয়ে আরো দুটি প্রবন্ধ ও ভাষণ সংকলিত হয়েছে। যেমন—(গ্রামবাসীদের প্রতি এবং (১) পল্লীসেবা। প্রথমটি শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীদের কাছে কবির ভাষণের প্রবন্ধরূপ এবং দ্বিতীয়টি শ্রীনিকেতনের উৎসবে কবির ভাষণ।

কবির অভিজ্ঞতা-পুষ্ট মনোভাবটি দুই প্রবন্ধ ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে বিস্তারিতভাবে। তা থেকে প্রথম যে কথাটি বেরিয়ে এসেছে, তা হলো— অনেকের মনে হতে পারে আধুনিক যুগে আধুনিক শিক্ষায় পাশচাত্য দেশের জনগণের বিপুল পরিমাণে আসবাবাপত্র, নানারকম আধুনিক আয়োজন-উপকরণের দ্বারা সমৃদ্ধ ও সুখী। কিন্তু তা নয়। কবি অনুভব করেছেন সেদেশের জনগণের মনে সুখ নেই। রয়েছে গভীর অশান্তি। সেদেশের চিন্তাশীল মনীষীরাও এখন ভাবতে বসেছেন যে, এত শক্তি, সম্পদ, জ্ঞান বিদ্যা সত্ত্বেও মানুষের মনে শান্তি নেই, সুখ নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত - আতঙ্কিত — ভয়ঙ্কর উপদ্রবের আশঙ্কায়। এর মূল উৎসটি কবির অনুভবে রয়েছে— মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস শেষে, পরস্পরে মানসিক বিচ্ছিন্নতায়। এবং তার পেছনে রয়েছে যন্ত্রযুগের অবদান। কারণ পশ্চিমদেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তা হয়েছে অতি বিপুল প্রচন্ড শক্তি সম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। কিন্তু কবি দেখেছেন এদেশে ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র। আর সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে সেদেশের মানুষ' (গ্রামবাসীদের প্রতি পরিশিষ্ট, রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১২৮)—যাদের মনে রয়েছে বিশ্বগ্রাসী লোভ, ভোগ্যবস্তুর সংগ্রহে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড স্বার্থগন্ধ। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে থাকে যে আত্মতৃপ্তি, সেটাই কবির মতে, মানব - আত্মার তৃপ্তি। কবির মতে তাই মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে। এই সম্বন্ধ স্বার্থগন্ধী ও সংকীর্ণ মনোভাবের সম্বন্ধ। শহরে তাই মানুষের চিত্ত সংকীর্ণ—গ্রামসমাজে মানুষ চিত্ত সম্পদে একদা ছিল ধনী। পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ ছিল বলেই গ্রামে অন্নবস্ত্র বাসস্থানের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মানুষের জীবনে সুখশান্তি ছিল। কবির মতে, এই আত্মীয়তার সেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না।

পরাধীন দারিদ্র্যপীড়িত বঞ্চিত বাংলার গ্রাম সমাজের অবস্থাও শোচনীয়। রোগজীর্ণতা শুধু নয়, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ছলনা-বঞ্চনা, দুর্নীতি, মামলা - মোকদ্দমায় জর্জরিত গ্রাম সমাজের মানুষ। তবু পূজা-পার্বনে আনন্দ উৎসবে সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করতে পারে বলেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হয়ে ওঠে। মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র নিষ্ফলা থাকে না। ভারতের গ্রামের মানুষ বিদ্যা, ঐশ্বর্য যতটা না চায়, তার থেকে বেশি চায় মানুষের এই আত্মার সম্পদ। কবি গ্রাম-সমাজের ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন মানুষজনের মধ্যে সম্মিলিতভাবে তাদের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রীনিকেতনে কবি জনসাধারণের সেই শক্তি সমবায়ের সাধনাকে সফল করে তোলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। (গ্রামবাসীদের প্রতি দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট, রাসিয়ার চিঠি, পৃ. ১৩৩)

'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে কবি প্রথমেই মানবজীবনের মূল লক্ষ্যটিতে ধরতে চেয়েছেন। আনন্দ স্বরূপের সন্ধান, তার আত্মপ্রকাশের কথা চিন্তা করেছেন। কবির মতে, মানুষের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে কর্মোদ্যম থেকে অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষের অভিব্যক্তির সঙ্গে অনন্ত আনন্দস্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনই মানুষের ধর্মসাধনা। কবির মতে, বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন, বহুজনের শক্তিসম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ - সুপ্রতিষ্ঠ করাই সভ্য মানবের লক্ষ্য। কিন্তু একালে মানবসম্বন্ধের মধ্যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সমাজে ক্ষমতাবান ও অক্ষমের মধ্যকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট করেছে। সমাজে প্রাণপ্রবাহের ধারা ক্ষীণ হয়েছে। পরিবেশ হয়েছে সংকীর্ণ। তাই যে পল্লী প্রকৃতিতে একদা প্রাণপ্রবাহ ছিল পরস্পরের সুস্থ সজীবতায় উচ্ছল, সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন, এখন তা নেই।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, 'পরাধীন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মানুষের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে যথাযোগ্য অন্নবস্ত্র' (ঐ, পৃ. ১৩৭) আর কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের জীবনযাপনের উপকরণগুলো রয়েছে অপর্যাপ্ত। তাই কবির মতে, চারদিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ। (ঐ, পৃ. ১৩৭) এই বিচ্ছেদ যেদিন ঘুচবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক - সম্বন্ধ যেদিন সহজ ও সাবলীল হবে, ভেদাভেদ থাকবে না জাতিধর্ম-সম্প্রদায়ের, সেদিন সব বর্বরতা চলে যাবে। সভ্যতার আলোয় মানুষের অন্তরাত্মা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠবে। সেদিন গ্রাম সমাজে সার্বিক শিক্ষাবিধি জনসাধারণের ভেতরকার অন্ধকারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মজার কথা— সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ। প্রথমে ছিল সেজবাতি, পরে এলো হ্যারিকেন। তারপর এলো বিজলিবাতি। সভ্যতার অগ্রগতির পথ ধরে সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, পঞ্জিকা-পুরোহিতের প্রকোপ-প্রভাব কমতে একালে ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে। পল্লীর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ - সম্পর্ক - শ্রদ্ধা - আত্মোৎসর্গের মনোভাব জাগ্রত না হলে মানুষের সমাজধর্ম এবং ধর্মসাধনা সার্থক হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের এই ধর্ম-সাধনার ভেতর দিয়েই পল্লীর মানুষকে সম্মিলিত ও একত্রীভূত করতে হবে, না হলে সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে না।

রবীন্দ্র - চেতনায় এই মানবধর্মের উদ্বোধনই তাঁর স্বদেশ-ভাবনার মূল কথা।